ational
Integration

46 নং ধারা—তপশিলি জাতি, উপজাতি ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণিদের জন্য বিশেষ শিক্ষামূলক স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

337 নং ধারা ইন্দো-ভারতীয় গোষ্ঠীর স্বার্থে শিক্ষামূলক অনুদানের ব্যবস্থা।

350A নং ধারা প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা।

63 নং ধারা—বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিকে জাতীয় গুরুত্ব প্রদান করা।

64 নং ধারা—যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারি অর্থে পরিচালিত সেগুলিকে সাংবিধানিক আইন দ্বারা জাতীয় গুরুত্ব প্রদান করা।

66 নং ধারা—গবেষণা, প্রযুক্তি ও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির নীতি নির্ধারণ ও সমন্বয়সাধন করা।

67 নং ধারা—প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সৌধ, সংরক্ষণ ও সেগুলিকে জাতীয় গুরুত্ব প্রদান প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

■ জাতীয়তার অর্থ (Meaning of Nationalism) ঃ

যখন জাতি, রাজনীতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির উর্ধ্বে উঠে প্রাক্ষোভিক অনুভূতি দ্বারা দেশের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায় তখন আমরা তাকে জাতীয়তাবাদ বলতে পারি।

Humaun Kabir এর মতে, 'Nationalism is that which depends on we feeling towards the nation'। দেশের নাগরিকদের অন্যতম কর্তব্য হল দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা এবং দেশের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ঐক্যকে বজায় রাখা। এবং যখন দেশের জনগণের মধ্যে এই ধরনের মনোভাব থাকে তখন তারা খুব সহজেই দেশের জন্য নিজেদের সম্পদ, প্রাণ এগুলি বিসর্জন দিতে পারে। তাই বলা যায় যে, জাতীয়তাবাদ হল সেই ধারণা যার মাধ্যমে দেশের জনগণ সংকীর্ণ পার্থক্যগুলির অনেক উর্ধ্বে উঠে দেশের বিকাশের জন্য একাত্মভাবে কাজ করতে পারে। জাতীয়তাবাদ হল সমস্ত হৃদয় দিয়ে দেশের প্রতি প্রশ্নাতীতভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করা যা দেশকে গৌরবময় ভবিষ্যৎ প্রদান করতে পারে।

জাতীয়তার ধারণাকে ***Jawaharlal Nehru*** বলেছেন, "Nationalism is such a strange element which while it instills life development energy and integration, at the same time makes it narrow because on account of it a person thinks about his own country as separate from other countries of the world." উপরের এই বক্তব্যটির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদের অন্য একটি দিককে তুলে ধরা যায়, তা হল জাতীয়তার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ—অন্যান্য দেশের প্রতি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামরিকভাবে বৈরী মনোভাব পোষণ। আবার জাতীয়তাবাদের এই ধারণাকে ভিত্তি করে অনেক দেশ তাদের জাতীয়তাবাদকে অন্যান্য দেশের উপর চাপিয়ে দিতে চায় এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় আমেরিকা বা ব্রিটেনের জাতীয়তাবাদের কথা।

● জাতীয় সংহতির অর্থ (Meaning of National Integration) ঃ

একটি দেশের সমস্ত নাগরিক যখন তাদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি ব্যতিরেকে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং একটি শক্তিশালী ইতিবাচক উপাদান হিসাবে কাজ করে তখন তাকে আমরা জাতীয় সংহতি বলতে পারি। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সংহতি কোনো ধারণা নয়, এটি একটা ক্রিয়া বা কর্ম যা যৌথভাবে একটা দেশের স্বার্থের ক্ষেত্রে প্রদর্শন করা হয়। তাই জাতীয়তারই একটা প্রকাশ হল জাতীয় সংহতি। তাই বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, জাতীয় সংহতি হল একটি প্রক্রিয়া আর জাতীয়তা হল তার বহিঃপ্রকাশ বা ফলশ্রুতি।

● জাতীয় সংহতির সমস্যাসমূহ (Problem of National Integration) ঃ

সাধারণত যে সমস্ত দেশগুলিতে সাংস্কৃতিক, ভাষাগত বা ধর্মীয় বিভেদ নেই সেই ক্ষেত্রে জাতীয় সংহতির কোনো সমস্যা দেখা যায় না। সেই কারণে যে-কোনো দেশের সামাজিক ও জাতীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে-কোনো একটি বিষয়ে ঐক্য বজায় রাখা প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের মতো দেশে জাতীয় সংহতি একটি অন্যতম সমস্যা। এর অন্যতম কারণগুলি হল—

(i) ভারতে বহু ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করে। কিন্তু যারা ধর্মীয় গোঁড়ামিতে ভোগে তাদের মধ্যে একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ বর্তমান।
(ii) পৃথিবীর প্রায় সব ধরনের জাতিগোষ্ঠীর সন্ধান এখানে পাওয়া যায়।
(iii) ভারতে প্রায় একশোর বেশি ভাষা ব্যবহার করা হয় যার রূপ অঞ্চলভেদে আবার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়।
(iv) ভারতের জনগণ বহু ধরনের সংস্কৃতিকে অনুসরণ করেছে।
(v) ভারতে প্রতিদিন গাছের শাখাপ্রশাখার মতো রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বাড়ছে।
(vi) ভারতে কয়েক শত জাতি আছে, যাদের আবার বহু উপজাতি বর্তমান।
(vii) ভারতে সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের ফলশ্রুতি এখানে সমভাবে বণ্টিত হয়নি।
(viii) সমাজে উচ্চ শ্রেণি এবং অধিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সাধারণ মানুষের জন্য জায়গা ছাড়তে চায় না।
(ix) ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার লোক মারা গেলেও সরকার এ বিষয়ে কোনো সুদৃঢ় প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি।

(x) রাজনৈতিক স্বার্থ, সংঘাত, আঞ্চলিকতাবাদ, অবাধ অনুপ্রবেশ, বিদেশি মদতপুষ্ট অভ্যন্তরীণ বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী সংগঠনগুলিও ভারতের জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে ভয়ংকর সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

● জাতীয় অসংহতির গুরুত্বপূর্ণ উৎসসমূহ (Important Sources of National Disintegration) :

▲ ***(1) ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাজন***—1947 খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার প্রাক্কালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও বহু মুসলিম ভারতে থেকে যান যাদের পুনর্বাসন সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনায় কিছু কিছু ভারতীয় গোঁড়া মুসলিম এবং গোঁড়া হিন্দুদের মনে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করেছে।

▲ ***(2) বহু ধর্মের উপস্থিতি***—ভারতবর্ষ সাংবিধানিক নীতিগত দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। আর ভারতে বহুধর্মের একত্র অবস্থান দেখা যায়। যেমন—হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, পার্শি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এইসব ধর্মের বহু শ্রেণিবিভাজন। এই ধর্মগুলির মধ্যে আবার মতাদর্শগত ভাবে নানা অমিল দেখা যায়। কারণ অনেকেই একে অপরের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব বজায় রাখে, ফলে জাতীয় সংহতি বিপন্ন হয়।

▲ ***(3) সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসাম্য***—ভারতীয় সমাজ উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত এই তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রত্যেকটি শ্রেণি আবার অর্থনৈতিক সুবিধার এবং দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য নিজস্ব গোষ্ঠী তৈরি করেছে। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে সামাজিক অসাম্য। দেশের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর অসম বণ্টনও এর জন্য অনেকটাই দায়ী। দিন দিন ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য আরও বাড়ছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য আবার শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানের মধ্যে বৈষম্য নিয়ে আসছে, ফলে ধনী-দরিদ্র বিদ্বেষ তৈরি হচ্ছে।

▲ ***(4) আঞ্চলিকতাবাদ বা আঞ্চলিক আশা-আকাঙ্ক্ষা***—স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতে ভাষাভিত্তিক বহু রাজ্য পুনর্গঠিত হয়েছে। যেমন—তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত আরও নানা রাজ্যে বিভক্ত হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড় এবং সকলেই সংখ্যালঘু হওয়ার জন্য বঞ্চনার শিকার হচ্ছে বলে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। অনেকে আবার আঞ্চলিক আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের দুর্বল শ্রেণি মনে করে সংঘবদ্ধ হচ্ছে এবং প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই রকম আঞ্চলিকতাবাদের জিগির তুলে পশ্চিমবঙ্গ সহ অসম, নাগাল্যান্ড বা জম্মু-কাশ্মীরের মতো রাজ্যগুলিতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ গড়ে তুলছে।

▲ ***(5) সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য***—ভারত বহুবিধ সংস্কৃতির মিলনের দেশ। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক আবার বহুক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক। মানুষের জীবনযাপনের বিভিন্ন পর্যায় বা স্তরের মধ্যেই এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। যুগ যুগ ব্যাপী ভারতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাসক শাসন করেছেন। তাঁরা অনেকেই দেশের সকল মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় এমন মিশ্র সংস্কৃতির প্রচলন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ মোগল সম্রাট আকবরের কথা বলা যায়। ব্রিটিশ শাসকরাও ভারতীয় সংস্কৃতিতে আধুনিকতার ছোঁয়া এনেছিলেন। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও ভারতীয় জনগণ তাদের আদি অকৃত্রিম সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার তা অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে শুরু হয়েছে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব—যা সামাজিক বিভাজনকে প্রকট করে তুলেছে।

▲ ***(6) সাধারণ ভাষার অনুপস্থিতি***—ভারতবর্ষে বসবাস করে অজস্র ভাষাভাষীর মানুষ। এদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে 20টি ভাষাকে ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হিন্দিকে জাতীয় ভাষা এবং ইংরেজিকে সরকারি ভাষা চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতীয় জনসংখ্যার প্রায় 50% হিন্দিভাষী। ভারতের বহু রাজ্যেই ইংরেজি বা অন্য কোনো আঞ্চলিক ভাষার প্রাধান্য দেখা যায়। আবার ভারতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি ভাষারই চলন দেখা যায়। এখনও পর্যন্ত সাধারণ মানুষের সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটা সাধারণ ভাষার প্রচলন করা সম্ভব হয়নি। ভাষার ঐক্যের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি সম্ভব।

▲ ***(7) অযোগ্য সামাজিক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব***—অতীতের রাজনৈতিক বা জাতীয়তাবাদী নেতা যেমন গান্ধিজি, সুভাষচন্দ্র, নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আজাদ প্রমুখের ন্যায় আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক বর্তমানে আর দেখা যায় না। অতীতের চিরবরেণ্য নেতাগণ শক্ত হাতে, দৃঢ় মতাদর্শকে সামনে রেখে সমগ্র সমাজকে মহামিলনের একটি সূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন। বর্তমান নেতারা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং আর্থিক লোভের বশবর্তী হয়ে এমন এমন কার্যকলাপ করছে যার অনেকটাই সামাজিক সংহতির ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করছে। এরা কেউই মানবিকতার খাতিরেও সমগ্র সমাজকে মেলাতে চায় না।

▲ ***(8) ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার অভাব***—শিক্ষা শৈশবকাল থেকেই শিশুর ব্যবহার এবং আচরণের মান নির্ধারণ করে। এবং শিশুকে যে-কোনো একটি সংস্কৃতি অন্ধভাবে অনুসরণ করার পরিবর্তে যুক্তি দিয়ে যে-কোনো জিজ্ঞাসাকে বোঝাতে শেখায়। তাই বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে সার্বিকভাবে কল্যাণকর ও গ্রহণযোগ্য বিষয়বস্তুর

শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ বা সংস্কৃতি নিরপেক্ষ না হওয়ায় নানা সামাজিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

▲ (9) বহুদলীয় ব্যবস্থা—ভারতবর্ষের আঞ্চলিক বৈষম্য বা আঞ্চলিক চাহিদা যে সমস্ত সমস্যা সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে অন্যতম হল বহুদলীয় ব্যবস্থা। অনেক সময় আঞ্চলিক চাহিদাগত পার্থক্যের কারণে আবার কোনো কোনো সময় কেন্দ্র বা রাজ্য স্তরে কোনো রাজ্য এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না দেখাতে পারায় মিলিজুলি সরকার তৈরি হয়েছে। ফলে এই ধরনের স্থিতিহীন সরকার কোনো জাতীয় নীতিগুলির দিকে নজর না দিয়ে ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির দিকে নজর দিয়েছে—যা জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছে।

▲ (10) সরকারি চাকুরিতে নিয়োগে অসদুপায় অবলম্বন—বর্তমান কালে সরকারি চাকুরিতে সংরক্ষণ এবং মেধাভিত্তিক নিয়োগ সত্ত্বেও পিছিয়ে পড়া জাতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি অন্যতম সমস্যার আকার ধারণ করেছে। এটি যুব সম্প্রদায়ের মনে এক তরফে হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার ঘটাচ্ছে। ঠিক আবার তেমনি মহিলাদের জন্য চাকুরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণও নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে, যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রে মোটেই অভিপ্রেত নয়।

▲ (11) জাতিভেদ প্রথা—ভারতীয় সমাজের একটি অন্যতম সমস্যা হল জাতিভেদ প্রথা। জাতিভেদকে যদি সাধারণ বংশানুক্রমিক বিভাজন হিসাবে ধরা হয় তবে তা কখনই সমস্যার সৃষ্টি করে না। কিন্তু যদি একে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি হিসাবে ধরা হয় তবে অবশ্যই তা অনেক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিটি গোষ্ঠীর নেতা নিজস্ব গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত করতে গেলে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। এতে জাতি দাঙ্গা সৃষ্টি হতে পারে।

▲ (12) সাম্প্রদায়িকতা—ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার সবথেকে বড়ো শত্রু হল সাম্প্রদায়িকতা। সাধারণত এটি হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘিষ্ঠের লড়াই। এর দ্বারাও ভারতের সংহতি বহুলাংশে বিপন্ন হচ্ছে।

● জাতীয় সংহতিকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education to ensure National Integration) :

ভারতকে যদি আমরা শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ দেশ রূপে গড়ে তুলতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষাই নাগরিকদের চরিত্র গঠন করতে পারে এবং তার আচরণকেও যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারে। একটি শিশু তার জীবনের প্রারম্ভিক পর্ব থেকেই সামাজিক আচার ও বিধিগুলি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে। ভারতে বহু জাতির লোক বসবাস করে, তাই প্রতিটি জাতি কেবল তাদের ভূখণ্ডগত ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবে এমন কথা সঠিক নয়। তাই সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মতো একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে গেলে শিক্ষাকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(1) বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত সমস্ত বিষয়গুলির পাঠ্যপুস্তককে ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে। আলোচ্য সমস্ত কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে এবং কোনো সংস্কৃতির আলোচনাকে প্রাধান্য দিলে চলবে না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ধারণা গড়ে তুলতে হবে যে সমস্ত নাগরিকদের নিয়েই ভারত রাষ্ট্র গঠিত, কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা জাতিকে নিয়ে নয়। পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে পাঠ্য বইতে যে সমস্ত জাতীয়তা বিরোধী বিষয়বস্তু আছে সেই বিষয়গুলি বর্জন করতে হবে।

(2) জাতীয় উৎসবগুলিতে যাতে সকলে সাগ্রহে অংশগ্রহণ করে সে বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে। এই উৎসবগুলি অবশ্যই সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা এবং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান দ্বারা আয়োজন করতে হবে। বিভিন্ন সময় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানগুলি স্মরণ রাখার জন্য তাঁদের নিয়ে অনুষ্ঠান, জন্মতিথি পালন ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলি সংগঠিত করতে হবে।

(3) বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভরতির ব্যাপারে এবং সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই সংরক্ষণের নীতি জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করতে পারে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। এবং জনগণ যাতে এটা মনে করে, যে-কোনো সময় রাষ্ট্র তাদের পাশে আছে এবং নিরাপত্তা প্রদান করছে সেইভাবে বিষয়টিকে পরিচালনা করতে হবে।

(4) ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক রচনায় ঐতিহাসিক শাসকদের প্রশাসনিক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। কোনো বিশেষ জাতির প্রতিনিধি রূপে নয়।

(5) সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে, তা সরকারি হোক অথবা বেসরকারি হোক, সবক্ষেত্রেই ত্রিভাষা নীতি অনুসরণ করে হিন্দি জাতীয় ভাষা, ইংরেজি সরকারি ভাষা এবং একটি আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

(6) শিক্ষার প্রশাসনিক দায়িত্ব কোনো ব্যক্তির উপর অর্পণের পূর্বে জাতীয়তার সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করতে হবে।

(7) বিভিন্ন সংস্কৃতি থেকে আগত ছাত্রছাত্রী যাতে বিদ্যালয়ে একে অপরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে তার অবাধ সুযোগ থাকতে হবে।

(8) প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার বিষয়সমূহ যাতে জাতীয় চরিত্র গঠনের সহায়ক হয় সেইভাবে তার বিষয়বস্তুগুলিকে পরিচালিত করতে হবে। সাক্ষরতা, জনসচেতনতা প্রভৃতি

বিষয়বস্তুগুলিকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে সেগুলি জাতীয় সংহতি সুদৃঢ়করণে পরিপূরক হয়।

(9) সারাদেশে ভারতীয় সমাজের জাতীয় চরিত্রকে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন নাটক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, আলোচনা সভা, বিতর্ক অনুষ্ঠান প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে তাতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।

(10) গণমাধ্যমগুলি শিক্ষামূলক নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচার করে জাতীয় সংহতি অটুট রাখার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষার মাধ্যমে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী যাঁরা এই গণমাধ্যমগুলিতে কাজ করেন তাঁরাও এই চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তবে বলা যায়, এই সংস্থাগুলির কর্ণধারও যেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ হন। কারণ তিনি যদি সংকীর্ণমনা হন তাহলে সেটি তাঁর চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হবে। যা তাঁর সংস্থার পক্ষে বিপজ্জনক।

(11) শিক্ষকরাই শিশুদের প্রশিক্ষণ দান করবেন, সেই কারণে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ যাতে যথাযথ হয় সেই দিকে নজর রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তাঁরা যাতে পক্ষপাতিত্বহীনভাবে নিজস্ব কার্যাবলি পরিচালনা করতে পারেন সেটাও দেখতে হবে।

এই বিষয়গুলি কোঠারি কমিশনের একটি বক্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায়— "Educational system must make its contribution to the development of habits, attitudes and qualities of character which will enable its citizens to bear and to counter act all those fissiparous tendencies which hinder the emergence of a broad national and secular outlook."

● জাতীয় সংহতি কমিটি (National Integration Committee) :

1967 খ্রিস্টাব্দে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির চেয়ারম্যানশিপে জাতীয় সংহতি কমিটি নির্মিত হয়। এর প্রথম অধিবেশন হয় শ্রীনগরে 1968 খ্রিস্টাব্দে। এই প্রথম অধিবেশনে জাতীয় সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষার কী ভূমিকা হতে পারে তা আলোচনা করা হয়। তার সঙ্গে জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্ন যে জড়িত সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয় সংহতি সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য আরও তিনটি উপকমিটি নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ—সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষা, আঞ্চলিকতাবাদ প্রতিরোধ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য সংগঠিত করার কথা বলা। এই বিষয়গুলির উপর সহযোগী কমিটিগুলি তাদের আলাপ-আলোচনায় উদ্ভূত বক্তব্য পেশ করেছে এবং জাতীয় সংহতি কমিটি বিষয়গুলি পর্যালোচনা করেছে। তবে এই বৃহৎ কার্যভার যে কেবল সরকার দ্বারা গ্রহণ করা সম্ভবপর নয় সে বিষয়েও সকলে একমত। এখানে সম্মিলিত জনতা এবং

ন্যান্য সংস্থাগুলিরও এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এই সংস্থা
সেগুলি হল—

(1) শিশুদের মধ্যে দেশের প্রতি আত্মত্যাগের চেতনার

(2) জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির সার্বিক দিক সম্পর্কে শি

(3) শিশুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মনোভাব এব
কাজ করার মনোভাব জাগ্রত করতে হবে।

(4) স্বাধীনতা সংগ্রাম, সংগঠিত বিভিন্ন বিপ্লব ইত্যাদি স
হবে। বিভিন্ন জাতীয় দিবসগুলি পালনের দায়িত্ব স

সর্বোপরি শিক্ষার এই ভূমিকাগুলি ছাড়াও আরও যে বি
হবে, সেগুলি হল—দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারস
রিত্র, মানসিক একতা ইত্যাদি যাতে সুদৃঢ় হয় তার উপর
কঠোরভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখা, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ
প্রতি সৎ ও পক্ষপাতিত্বহীন মনোভাব বজায় রাখা ইত্যাদি